গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না

২০৪১ এর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে স্মার্ট নাগরিক তৈরির বিকল্প নেই। ভবিষ্যতের দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সাথে খাপ খাওয়াতে হলে শুধু মুখস্থ করায় পারদর্শী নাগরিক তৈরী করলে চলবে না। আমাদের এমন নাগরিক দরকার যে পাঠ্য বিষয়বস্তু সক্রিয় শিখনের মাধ্যমে অনুধাবন করে আত্মস্থ করবে, যেন তা পরে প্রয়োজনমতো প্রয়োগও করতে পারে। একইসাথে হাতে কলমে কাজ শিখে দক্ষ নাগরিক হবে। হবে দেশপ্রেমিক কিন্তু বিশ্ব নাগরিক, প্রতিযোগিতার বদলে সহযোগিতা করতে পারদর্শী এবং পরিবর্তনের সাথে নিজের যোগ্যতার রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম। নতুন শিক্ষাক্রম তেমন স্মার্ট নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে।

এই লক্ষ্য নিয়ে ১০ বছরব্যাপী শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। প্রথমেই ২০১৭-১৮ সালে ৬ টি গবেষণা করে, ২০১৯ এ ৮০০ (আটশত) এর অধিক অংশীজনের সাথে মতবিনিময় ও বিভিন্ন দেশের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করে রূপরেখার খসড়া তৈরি করা হয়। এরপরে ২০২১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদনের পরে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় অনুমোদিত হয়। ২০২২ সালে পাইলটিং এর পরে ২০২৩ সাল থেকে ধাপে ধাপে ২০২৭ সালে পুরো শিক্ষাক্রম বাস্তবায়িত হবে।

বলা হচ্ছে - পড়াশুনা নেই, পরীক্ষা নেই, শিক্ষার্থীরা কিছু শিখছে না। এটি মিথ্যাচার। মানুষকে বিভ্রান্ত করবার জন্য এসব বলা হচ্ছে। এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি পড়বে, নিজেরা সক্রিয়ভাবে পড়বে, শিখবে। গ্রুপ ওয়ার্ক করে আবার তা নিজেরাই উপস্থাপন করবে। শুধু জ্ঞান নয়, দক্ষতাও অর্জন করবে। আর মূল্যায়ন হবে প্রতিটি কাজের। আবার ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন এবং বার্ষিক মূল্যায়নও হবে। কাজেই পরীক্ষা ঠিকই থাকছে, কিন্তু পরীক্ষার ভীতি থাকছে না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং না হওয়াও আছে। শুধু তাই নয়, পারদর্শিতার ৭টি স্কেলে তাদের রিপোর্ট কার্ডও আছে।

অভিভাবকদের একটি উদ্বেগ হচ্ছে - বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়ালেখার জন্য তাঁদের সন্তানদের কীভাবে নির্বাচন করা হবে বা চাকুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের সন্তানদের ফলাফলকে কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে। এই শিক্ষাক্রমের শিক্ষার্থীরা যখন উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করবে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়াতেও পরিবর্তন আসবে। চাকুরির ক্ষেত্রেও পারদর্শিতার মূল্যায়নের ভিত্তিতেই নিয়োগ হবে। সেসব কার্যক্রমও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

নতুন শিক্ষাক্রম ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নাগরিক তৈরি করবে। এরা হবে সৎ, মানবিক, সহমর্মী, সৃজনশীল, উৎপাদনক্ষম, উদ্যোগী। এরা শুধু চাকুরি করবে না, নিজেরাই উদ্যোক্তা হবে, চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করবে।

এই শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীরা খুশি। সচেতন অভিভাবকরা খুশি; তাঁদের সন্তান আনন্দের সঙ্গে স্কুলে যাচ্ছে, শিখছে। অভিভাবকদের আর কোচিংয়ের, নোট-গাইডের বায়ের বোঝাও বইতে হবে না। তরুণ শিক্ষকরাও খুশি। অখুশি কেবল কোচিংয়ের শিক্ষকরা। আর যে অভিভাবকরা সন্তান প্রথম দ্বিতীয় হবার জন্য খুবই উদগ্রীব, শিখল কি না, বা দেহ-মনে সুস্থ মানুষ হলো কি না তা নিয়ে ভাবেননা - তারা অখুশি। একবার ভেবে দেখুন - মাঝেমাঝে আমাদের কোনো কোনো সন্তান যে মানসিক চাপ সইতে না পেরে আত্মহত্যার মতো পথ বেছে নেয়, আমরা কি আমাদের এই অতিমাত্রায় প্রতিযোগী মনোভাবের কারণে তাকে উস্কে দিচ্ছি না?

শিক্ষাক্রম নিয়ে কোচিং ব্যবসায়ী ও নোট-গাইড ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে অপপ্রচারে নেমেছে। অন্যদিকে নির্বাচনকে সামনে রেখে হীন রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের লক্ষে একটি গোষ্ঠী পাঠ্যপুস্তক নিয়ে মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছে। গত জানুয়ারিতে এরা সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেয়ার লক্ষ্যে বই নিয়ে মিথ্যাচার করেছিলো। এরা চায় না শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে শিখতে শিখুক, চিন্তা করতে শিখুক, অনুসন্ধিৎসু হোক, মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার চর্চা করুক। ওরা চায় মগজ ধোলাইয়ের শিক্ষাই চালু থাকুক।

যে কোনো পরিবর্তনই মেনে নিতে, খাপ খাইয়ে নিতে কষ্ট হয়। আর রূপান্তরকে মেনে নেয়া আরও কষ্টকর। কিন্তু বুঝতে হবে - এই রূপান্তর এগিয়ে যাবার জন্য অবশ্যম্ভাবী, এর কোন বিকল্প নেই। একমাত্র বিকল্প হলো পিছিয়ে পড়া, নতুন প্রজন্মের জীবনকে ব্যর্থ করে দেয়া। যা আমরা কিছুতেই হতে দিতে পারি না।

১৯৭১ এ বঙ্গবন্ধু জানতেন আমাদের অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। অবর্ণনীয় কষ্ট করতে হবে। কিন্তু স্বাধীনতার কোন বিকল্প ছিলো না। তাই তিনি মুক্তিযুদ্ধের পথকেই বেছে নিয়েছিলেন।

আর এ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে তো তেমন কোনো ত্যাগের প্রয়োজন নেই। কোচিং ব্যবসায়ী, নোট-গাইড ব্যবসায়ীরা অন্য কোনো ব্যবসা শুরু করবেন। একটু খাপ খাওয়াতে হয়তো সময় নেবে।

অভিভাবকরা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের কথা ভাবুন। তাদের দক্ষ যোগ্য মানুষ হবার কথা ভাবুন। তাদের যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিয়ে উৎকর্ষ লাভের কথা ভাবুন। একবার ভীষণ প্রতিযোগিতার চিন্তা থেকে বেরিয়ে সহযোগিতার, সহমর্মিতার চর্চার মধ্য দিয়ে সন্তানের সুখী ভালো মানুষ হবার কথা ভাবুন।

খরচ বাড়ার কথা বলা হচ্ছে। উপকরণ ব্যয় বাড়বার কোনো কারণ নেই। শিক্ষক নির্দেশিকায় স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এবারের প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের পুরনো পত্রিকা, ক্যালেন্ডার, যেসব জিনিস কাজে লাগছে না সেসব জিনিসকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার বিশেষ নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। আর নোট-গাইড কিংবা কোচিংয়ের খরচ তো লাগবেই না।

রান্না করার বিষয়টি অতিরঞ্জিত করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। সারাবছরে একদিন শুধু পিকনিক করে রান্না শিখবে। বাড়ী থেকে রান্না করে আনবার কোনো নির্দেশনা নেই। অতি উৎসাহী কোনো কোনো শিক্ষক এমন নির্দেশনা দিচ্ছেন। আমরা এ বিষয়ে শিক্ষকদের সচেতন হবার অনুরোধ জানাচ্ছি।

শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়াবার জন্য প্রশিক্ষণ চলছে। ক্রমাগত প্রশিক্ষণ চলবে। শিক্ষকদের জীবনমান উন্নয়নেও সরকার আরও পদক্ষেপ নেবে। কারণ এরও কোনো বিকল্প নেই।

কাজেই নতুন শিক্ষাক্রমকে স্বাগত জানান। নতুন প্রজন্মের জন্য সম্ভাবনার সকল দ্বার উন্মুক্ত করে দিন। স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নাগরিক তৈরিতে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে আপনার সমর্থনের মাধ্যমে আপনিও শরিক হোন।

আসুন, আমরা সবাই মিলে আমাদের সন্তানদের সুখী-সমৃদ্ধ ও নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি- নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে অপপ্রচার বিষয়ে ব্যাখ্যা

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গঠনের স্বপ্ন নিয়ে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার যে কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন, তারই অংশ হিসেবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা হয়েছে, শিক্ষা ব্যবস্থার এই রূপান্তরের মধ্যে দিয়েই ভবিষ্যতের স্মার্ট শিক্ষার্থীর বুনিয়াদ রচিত হবে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষাক্রম প্রণয়নের উদ্দেশ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার সকল ধারাকে বিবেচনা করে প্রথমবারের মতো জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই রূপরেখা প্রণয়ন এবং তার ভিত্তিতে বিস্তারিত শিক্ষাক্রম, শিখন শেখানো সামগ্রী এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নতুন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে, যা এর আগে কখনোই অনুসরণ করা হয়নি। শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পূর্বে ২০১৭-২০১৮ সালে এনসিটিবি কর্তৃক ০৮টি গবেষণা পরিচালিত হয়, যার ভিত্তিতে এই রূপরেখা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর বাস্তবতা অনেকটাই পালটে যাচ্ছে। শ্রমনির্ভর অর্থনীতির মডেল সামনে হুমকির মুখে পড়তে যাচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও প্রযুক্তির প্রসারের ফলে ভবিষ্যতে নতুন অনেক কর্মসংস্থান তৈরি হবে, যার কারণে বর্তমান সময়ের অনেক পেশা ও শ্রম অচিরেই প্রাসঙ্গিকতা হারাবে। এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাংলাদেশের সম্ভাবনার দিক হলো এদেশের বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠী, যার জনমিতিক সুফল পেতে হলে অনতিবিলম্বে আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা প্রয়োজন ছিল।

Brookings Report (2016) on Skills for Changing World এ দেখা যায়, ১০২টি দেশের মধ্যে ৭৬ টি দেশের শিক্ষাক্রমে সুনির্দিষ্টভাবে দক্ষতাভিত্তিক যোগ্যতাকে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ৫১টি দেশের শিক্ষাক্রম সম্পূর্ণ রূপান্তরমূলক দক্ষতাভিত্তিক করা হয়েছে। OECD(2018) ভুক্ত দেশগুলোও এই পরিবর্তিত সময়ের চাহিদা অনুযায়ী একটা সাধারণ শিক্ষাক্রম রূপরেখা তৈরি করেছে, বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশও যার অংশীদার। এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর দিকে তাকালেও দেখা যায়, ভুটান, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকাসহ অন্যান্য দেশও তাদের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের কাজ শুরু করেছে। বাংলাদেশও একইভাবে শিক্ষাব্যবস্থায় একটি সার্বিক পরিবর্তনের তাগিদ অনুভব করছিল যা একই সাথে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন, শিখন পরিবেশ, শিখন উপকরণ, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, এলাকার জনগণসহ সকল উপাদানের মাঝে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপণের মাধ্যমে একই পরিবর্তনের ধারায় নিয়ে আসবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ সেই দীর্ঘ তাগিদ, পরিকল্পনা, গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ফসল। কাজেই নি:সন্দেহে এটি বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

কিন্তু নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক নিয়ে মিথ্যাচার হচ্ছে। গত জানুয়ারিতে এর সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার লক্ষ্যে বই নিয়ে মিথ্যাচার করেছিলো। এরা চায় না শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে শিখতে, চিন্তা করতে শিখুক, অনুসন্ধিৎসু হোক, মুক্তবুদ্ধি ও মুক্ত চিন্তার চর্চা করুক। ওরা চায় মগজ ধোলাইয়ের শিক্ষাই চালু থাকুক। তাই ওখানে উল্লিখিত অপপ্রচারগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকুন:

ভুল তথ্য	সঠিক ব্যাখ্যা
পড়াশুনা নেই, পরীক্ষা নেই	
পড়াশুনা নেই, পরীক্ষা নেই, শিক্ষার্থীরা কিছু শিখছে না।	শিক্ষার্থীরা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি পড়বে, নিজেরা সক্রিয়ভাবে পড়বে, শিখবে। দলগত কাজ করে আবার তা নিজেরাই উপস্থাপন করবে। শুধু জ্ঞান নয়, দক্ষতাও অর্জন করবে। আর মূল্যায়ন হবে প্রতিটি কাজের। আবার যাণ্মাসিক মূল্যায়ন এবং বার্ষিক মূল্যায়নও হবে। কাজেই পরীক্ষা ঠিকই থাকছে, কিন্তু পরীক্ষার ভীতি থাকছে না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং না হওয়া আছে; শুধা তাই নয়, পারদর্শিতার ৭টি স্কেলে তাদের রিপোর্ট কার্ডও আছে।

বিজ্ঞান	
আগে নবম-দশম শ্রেণিতে বিজ্ঞান ছিল ৪০০ নম্বরের, নতুন শিক্ষাক্রমে তা কমিয়ে করা হয়েছে ১০০ নম্বরের!	নতুন শিক্ষাক্রমে কোনো বিষয়ের জন্যই নির্দিষ্ট নম্বর বরাদ্দ নেই, আছে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার পর্যায়। কাজেই এই বক্তব্যের কোনো ভিত্তি নেই।
নতুন শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কমিয়ে দেওয়া হয়েছে!	নতুন শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ থেকে দশম পর্যন্ত সকল শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি সময় রাখা হয়েছে। কাজেই সার্বিক দিক দিয়ে আগের চেয়ে বিজ্ঞানের গুরুত্ব বেড়েছে, বিষয়বস্তুর পরিধিও বেড়েছে।
ব্রিটেনের কারিকুলমে নবম শ্রেণিতে বিষয় বাছাইয়ের সুযোগ আছে, কিন্তু বাংলা মাধ্যমে তা রাখা হয়নি!	প্রচলিত ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাক্রম এবং ইংল্যান্ডের জাতীয় শিক্ষাক্রম এক নয়। ইংল্যান্ডসহ পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের শিক্ষাক্রমেই নবম (ক্ষেত্র বিশেষ দশম) শ্রেণি পর্যন্ত বিষয় নির্বাচনের সুযোগ থাকে না।
শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাকে খাটো করতে বিভাগ বিভাজন তুলে দেওয়া হয়েছে!	নবম শ্রেণিতে পৃথিবীর প্রায় কোনো দেশেই বিভাগ বিভাজন করা হয় না। দশম বা একাদশ শ্রেণিতে গিয়ে সাধারণত বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়।
উপকরণ	
প্রচুর উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা ব্যয় অনেক বেড়েছে।	দামি উপকরণ, চাকচিক্য বা সৌন্দর্য এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়। স্থানীয়, সহজলভ্য ও পুন:ব্যবহারযোগ্য কাগজ ও উপকরণ ব্যবহারের নির্দেশনা বার বার দেওয়া হয়েছে। ফলে ব্যয় বাড়ার কোনো কারণ নেই। আর নোট বই কিংবা কোচিংয়ের খরচ তো লাগবেই না।
গ্রামের স্কুল উপকরণ পাবে না বা দরিদ্র জনগোষ্ঠির উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষম্য বাড়ছে।	তৃণমূল পর্যায়ে সহজলভ্যতা নিশ্চিত করেই উপকরণ, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ইত্যাদি নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রতি ক্ষেত্রেই বিকল্প উপায় রাখা হয়েছে, ফলে বৈষম্য তো নয়ই বরং গ্রামের বিদ্যালয়গুলো ভালো করছে। তাছাড়া কোচিং, গাইড বইয়ের ব্যয় লাগছে না ফলে বৈষম্য কমছে এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীরা ভালো করছে।
বাড়িতে দলগত কাজ/রান্না	
বাসায় গিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাস্তবে সম্ভব নয় ফলে ডিভাইস নির্ভরতা বাড়ছে।	সকল দলগত কাজ বিদ্যালয়ে করার নির্দেশনা দেওয়া আছে। বাড়িতে কোনো দলগত কাজ দেওয়া হয় না।
বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন।	বাড়ি থেকে রান্না করা কোনো খাবার আসার নির্দেশনা নেই। জীবন দক্ষতার অংশ হিসেবে শুধুমাত্র একটি অভিজ্ঞতায় নির্দিষ্ট ক্লাসে রান্নার কাজ আছে।
ভাষা	
শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিখছে না।	যে কোনো সময়ের চেয়ে শিক্ষার্থীদের এখন বেশি লিখতে হচ্ছে, কারণ প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতায় তাদের বিভিন্নভাবে প্রায়োগিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত:স্ফূর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে।
গণিত	
গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই।	প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাস্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে।
ধর্মশিক্ষায় লিখিত পরীক্ষা	
ধর্মশিক্ষায় লিখিত পরীক্ষা রাখা হয়নি।	সকল বিষয়ের জন্য একই পদ্ধতিতে মূল্যায়ন ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে লিখিত মূল্যায়নও অন্তর্ভূক্ত আছে।

বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষার সুযোগ কমে গিয়েছে?	
শিক্ষা দক্ষতাভিত্তিক করতে গিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষার সুযোগ কমে গিয়েছে।	বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে জেনে, বুঝে, উপলব্ধি ও অনুধাবন করে তা প্রয়োগ করার মাধ্যোম সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় নতুন ধারণার অনুসন্ধান করা। মুখস্থনির্ভরতা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটায় না।
বিশ্ববিদ্যালয় ও চাকুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে কী হবে?	
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়ালেখার জন্য তাঁদের সন্তানরা ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবেনা।	এই শিক্ষাক্রমের শিক্ষার্থীরা যখন উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করবে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ভর্তি প্রক্রিয়াতেও পরিবর্তন হবে। সেসব কার্যক্রমও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।
চাকুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের সন্তানদের ফলাফল কাজে আসবেনা।	চাকুরির ক্ষেত্রেও পারদর্শিতার মূল্যায়নের ভিত্তিতেই নিয়োগ হবে। সেসব কার্যক্রমও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

- যেকোনো পরিবর্তনই মেনে নিতে, খাপ খাইয়ে নিতে কষ্ট হয়। আর রূপান্তরকে মেনে নেওয়া আরও কষ্টকর। কিন্তু বুঝতে হবে- এই রূপান্তর এগিয়ে যাবার জন্য অবশ্যম্ভাবী; এর কোনো বিকল্প নেই। একমাত্র বিকল্প হলো পিছিয়ে পড়া, নতুন প্রজন্মের জীবনকে ব্যর্থ করে দেওয়া। যা আমরা কিছুতেই হতে দিতে পারি না।
- অভিভাবকরা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের কথা ভাবুন। তাদের দক্ষ, যোগ্য মানুষ হবার কথা ভাবুন। তাদের যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিয়ে উৎকর্ষ লাভের কথা ভাবুন। একবার ভীষণ প্রতিযোগিতার চিন্তা থেকে বেরিয়ে সহযোগিতার, সহমর্মিতার চর্চার মধ্য দিয়ে সন্তানের ভালো মানুষ হওয়ার কথা ভাবুন।
- শিক্ষকদেরও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ চলছে। তাঁদেরও জীবনমান উন্নয়নে সরকার আরও পদক্ষেপ নেবে। কারণ এরও কোনো বিকল্প নেই।
- কাজেই নতুন শিক্ষাক্রমকে স্বাগত জানান। নতুন প্রজন্মের জন্য সম্ভাবনার সকল দ্বার উন্মুক্ত করে দিন। স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নাগরিক তৈরিতে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে আপনার সমর্থনের মাধ্যমে আপনিও শরিক হোন।

সুতরাং অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে নিজে যাচাই করুন, সঠিক তথ্য জানার চেষ্টা করুন।
স্বার্থান্বেষী কোনো মহলের ফাঁদে যা দেবেন না।

শিক্ষায় রূপান্তর একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ, এর বিকল্প নেই।
সরকার শিক্ষকদের জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে যা চলমান রয়েছে। সকলের সহযোগিতায় এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার যথাযথ বাস্তবায়ন আমাদের শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করবে।